আমার দেশ | বুধবার ২৮ জানুয়ারি ২০০৯, ১৫ মাঘ ১৪১৫

নারী নির্যাতন প্রতিরোধে করণীয়

ইয়াসমীন আরা লেখা

পৃথিবীর সব দেশেই কন্যা, জায়া, জননী রূপে নারীর অবস্থান। বাংলাদেশ এর ব্যতিক্রম নয় বরং এই তিন রূপে স্নেহ, ভালোবাসা, মমতা ও প্রেরণাদানকারী হিসাবে নারীর অবস্থান সমুন্নত। পবিত্র ইসলাম ধর্ম এবং বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় দলিল সংবিধান নারীকে মর্যাদার আসন দিয়েছে। তা সত্ত্বেও আমাদের সমাজে আজো কিছু কিছু লিঙ্গ বৈষম্যের কারণে নারী যুগ যুগ ধরে কোণঠাসা হয়ে রয়েছে। অথচ আজকের নারী সমাজ পুরুষের পাশাপাশি সমান তালে সমাজের বৃহত্তর কর্মকাণ্ডে অবদান রেখে চলেছে। শিক্ষা ক্ষেত্রেও নারীরা আগের তুলনায় অনেকটা এগিয়ে। যে সব নারী সাক্ষর ও শিক্ষিত তারাও তথাকথিত সমাজের ঘেরাটোপ থেকে নিজেকে পুরোপুরি বাইরে বের করে আনতে পারেনি। ফলে বাংলাদেশে নারী শব্দটির সঙ্গে অনুষঙ্গ হিসেবে যে নির্যাতন শব্দটি জড়িয়ে আছে, সেটা থেকে নারীকে পুরো মুক্ত করতে হবে।

কোথাও কোথাও দেখা যায়, জন্মের পর থেকেই কন্যাশিশু নির্যাতনের শিকার হয়। এমন উদাহরণ প্রায়ই দেখা যায়। কন্যাশিশু জন্মদানের কারণে কোনো কোনো নারীর ঘর ভেঙেছে, কারো জীবনে নেমে এসেছে স্বামী এবং স্বামীর পরিবারের সদস্যদের দ্বারা শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন। কন্যাশিশুটি জন্মের পর থেকে যে বৈষম্যের শিকার হয়, জীবন পরিক্রমার বিভিন্ন স্তরে তা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। বাংলাদেশে নারী শিক্ষার হার যে তুলনামূলকভাবে কম, তার পেছনে মূলত এ বৈষম্যই দায়ী। যে সব মেয়ে লেখাপড়ার সুযোগ পায়, এই সুযোগের দিক থেকেও তাদের ছেলেদের চেয়ে পেছনে রাখা হয়। এর ফলে সুযোগপ্রাপ্ত মেয়েরা পরিপূর্ণভাবে শিক্ষিত ও প্রত্যয়ী হয়ে গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে মাঝে মধ্যে হোঁচট খায়। একটি ছেলেশিশু শিক্ষিত হয়ে যেভাবে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয়ে সমাজে তার অবস্থান দৃঢ় করতে সক্ষম হয়, একটি মেয়ে তা পারে না। নারীর মধ্যে প্রায়ই দ্বিধাদ্বন্দ্ব ক্রাজ করে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণে এই দ্বিধা তাদের পিছিয়ে দেয়।

জন্মের পর কন্যাশিশু যে বৈষম্যজনিত নির্যাতনের শিকার হয়, তা তাদের অবধারিত নিয়তি হয়ে যায়। পিতা ও স্বামীর পরিবারে, কর্মক্ষেত্রে নারী যেখানেই যাক না কেন, নির্যাতন থেকে যেন তার অব্যাহতি নেই। অ্যাসিড নিক্ষেপ, হত্যা, অপহরণ, ধর্ষণ, শারীরিক ও মানসিক শাস্তি—এগুলো প্রায়ই আমরা দেখতে পাই। চোখের আড়ালে এ রকম ঘটনা আরো কত ঘটে তার অনেক খবরই আমরা পাই না। প্রায়ই দেখা যায় নারীকে ধর্ষণের পর শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়, অ্যাসিড নিক্ষেপ করে নারীর মুখাবয়বকে বিকৃত করা হয়। শ্রম ক্ষেত্রেও নারীরা বৈষম্যের শিকার হয়। একই ধরনের শারীরিক শ্রম দিয়েও নারী পুরুষের চেয়ে কম মজুরি পায়। যে সব নারী শিক্ষা লাভ করে অফিস-আদালতে চাকরির সুযোগ পায়, তারাও পুরুষ সহকর্মী বা বসের দ্বারা বিভিন্নভাবে নির্যাতনের শিকার হয়। স্কুল-কলেজ পড়ুয়া মেয়েরা সমাজে বখাটে তরুণদের দ্বারা উত্যক্তের শিকার হয়ে অনেক সময় আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়। শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, সাক্ষর বা নিরক্ষর যে পর্যায়েরই হোক না কেন, সব ধরনের গৃহবধূ স্বামী ও স্বামীর পরিবারের সদস্যদের দ্বারা কম-বেশি শারীরিক কিংবা মানসিকভাবে নির্যাতিত হয়। যৌতুকের কারণে হত্যা, নির্যাতন নিম্নবিত্তদের জন্যে সাধারণ ঘটনা হলেও উচ্চবিত্ত সমাজেও এ উদাহরণ রয়েছে। এই যে ভয়াবহ অবস্থা আমাদের সমাজে দুষ্ট ক্ষতের মতো চেপে বসেছে, এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ যে আমরা খুব সহজে পাব, তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। দুঃখজনক হলেও সত্য, সমাজের এ অবস্থা থেকে শিক্ষিত নারীরাও বের আসতে পারেনি। লোকলজ্জার ভয়ে, ঘরভাঙার আশঙ্কায় অনেকেই মুখ বুজে এ সব হজম করে নিচ্ছে।

পবিত্র ইসলাম ধর্মে বার বার নারীর মর্যাদা সমুন্নত রাখার কথা বলা হয়েছে। ইসলামই সর্বপ্রথম নারীকে কন্যা, স্ত্রী, মায়ের মর্যাদা ও সম্মান দান করেছে। ইসলাম মানবতাবিরোধী ভাবধারা সম্পন্ন কাজ করতে নিষেধ করেছে এবং কন্যাসন্তানকে পুরুষের মতোই জীবনে বেঁচে থাকার অধিকার দিয়েছে। রাসূল (স.) বলেছেন, 'যার কোনো কন্যাসন্তান রয়েছে এবং সে তাকে জীবন্ত প্রোথিত করেনি, তাকে ঘৃণার চোখেও দেখেনি এবং তার ওপর নিজ পুত্রসন্তানকে অগ্রাধিকারও দেয়নি, তাকে আল্লাহ জান্নাত দান করবেন' (আবু দাউদ, কিতাবুল আদব)। ইসলামই সর্বপ্রথম নারীকে পিতার সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হওয়ার অধিকার প্রদান করেছে। তৎকালীন আরব সমাজে স্ত্রী হিসেবেও নারীদের চরম অমর্যাদা ও অপমান ভোগ করতে হতো। নারীদের সঙ্গে নিতান্ত দাসী-বাঁদীর মতো ব্যবহার করা হতো। ইসলাম স্ত্রী হিসেবে নারীদের এ অপমান দূর করে তাদের সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছে। এ সম্পর্কে আল কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'স্ত্রীদেরও তেমনি অধিকার রয়েছে যেমন স্বামীদের রয়েছে তাদের ওপর এবং তা যথাযথভাবে আদায় করতে হবে' (সূরা বাকারা, আয়াত-২২৮)। ইসলামে মা হিসেবে নারীকে যে উচ্চ মর্যাদা ও সম্মান দেয়া হয়েছে, পৃথিবীর অন্য কোনো সম্মানের সঙ্গেই তার তুলনা হতে পারে না। রাসূল (স.) বলেছেন, 'মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত'।

ইসলাম নারীকে শুধু কন্যা, স্ত্রী এবং মা হিসেবেই সম্মান দেয়নি বরং সমাজের একজন মানুষ হিসেবেও পুরুষের সমান মর্যাদা দান করেছে। কোরআন মজিদে ঘোষণা হয়েছে, 'পুরুষ বা স্ত্রী যে লোকই নেক আমল

করবে ঈমানদার হয়ে, সেই বেহেশতে দাখিল হতে পারবে এবং এদের কারো ওপর এক বিন্দু জুলুম করা হবে না' (সূরা নিসা, আয়াত-১২৪)। বস্তুত ইসলামী শরিয়ত নারী-পুরুষ উভয়কেই সমান সামাজিক মর্যাদা ও অধিকার দিয়েছে।

বাংলাদেশের সংবিধানেও জনগণের যে সব মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে, তাতে রয়েছে সব নাগরিকের অধিকার সমান। নাগরিক বলতে ধনী, গরিব, নারী, পুরুষ—সবাইকে বোঝানো হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সংবিধানের ২৭ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, সব নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী। ২৮ নম্বর অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে—(১) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদে বা জন্মস্থানের কারণে রাষ্ট্র নাগরিকের প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করবে না; (২) রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষ সমান অধিকার লাভ করবে; (৩) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদে বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোনো বিনোদন বা বিশ্রাম স্থানে প্রবেশে কিংবা কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি বিষয়ে কোনো নাগরিককে কোনোরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাবে না। ২৯ নম্বর অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে, প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে সব নাগরিকের জন্যে সুযোগের সমতা থাকবে।

ধর্ম ও সংবিধানে নারীর অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা থাকা সত্ত্বেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে কেন নারী নির্যাতন বন্ধ হচ্ছে না বরং নিত্যনতুন রূপে বিভিন্ন মাত্রায় নারী নির্যাতন চলছে এর কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে বহু কারণ বেরিয়ে আসে। প্রথম ও প্রধান যে কারণ শনাক্ত করা যায় তা হলো, শিক্ষা ও সচেতনতার অভাব। অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনের ফলে আচরণগত ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত স্থায়ী পরিবর্তনকে শিক্ষা বলে। শিক্ষা হলো উন্নয়নের পূর্বশর্ত। বাংলাদেশে সামগ্রিকভাবে শিক্ষার হার কম, শতকরা প্রায় ৬৫ ভাগ মাত্র। এর মধ্যে নারী শিক্ষার হার আরো কম। এই তথাকথিত শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে বেশির ভাগই কেবল নাম-স্বাক্ষর করতে পারে। আবার যারা প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার সুযোগ পেয়েছে, তাদের অধিকাংশ সার্টিফিকেটধারী শিক্ষিত। এর ফলে শিক্ষার মাধ্যমে তাদের আচরণে কোনো পরিবর্তন সূচিত হয় না। তাই কিছু সংখ্যক পুরুষ যেমন নারীকে একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে ভাবতে পারে না, একইভাবে নারীরাও প্রত্যয়ী হয়ে নিজেকে একজন পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে ভাবার সাহস পায় না। এছাড়া বাংলাদেশের শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে যে কারিকুলাম অনুসরণ করা হয়, তার মধ্যে প্রায়োগিকতা খুব কম। ফলে ন্যূনতম শিক্ষিত বা শিক্ষিত জনগোষ্ঠী অর্জিত শিক্ষাকে প্রয়োগমুখী ও সাধারণীকরণ করতে পারে না। এতে শিক্ষাটা তাদের কাছে কাগুজে বিদ্যা হিসেবে থেকে যায় এবং যুগ যুগ ধরে তাদের পূর্বপুরুষরা যা করে এসেছে, বর্তমান প্রজন্মের কেউ কেউ সেই ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় এবং নারীরাও চিরাচরিত প্রথা মনে করে মুখ বুঝে নির্যাতন সহ্য করে নেয়াকেই নিয়তি বলে মনে করে।

একটি দেশের উন্নয়নের জন্যে নারী ও পুরুষের সমানভাবে অংশগ্রহণ প্রয়োজন। এ জন্যে নারী নির্যাতন ও বৈষম্য বন্ধ করে তাদের উন্নয়নে অংশীদার করতে হবে। প্রকৃত শিক্ষায় দেশের আপামর জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করার সঙ্গে সঙ্গে এ ব্যাপারে তাদের সচেতন করতে হবে। শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের কারিকুলামকে আধুনিক করতে হবে, শিক্ষা দানের কাজে নিয়োজিত শিক্ষকদের উপযুক্তভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে, যাতে পুঁথিকেন্দ্রিক জ্ঞানের পরিবর্তে শিক্ষাকে অনুধাবনের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যায়। এ সম্পর্কিত ধর্মের বিধি-বিধান-সমূহ, সংবিধানের বিধান উপযুক্তভাবে কারিকুলামে সন্নিবেশ করতে হবে। একইভাবে উপানুষ্ঠানিক কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর কাছেও এ সংক্রান্ত বার্তা পৌঁছাতে হবে। নারীকে তার অধিকার বুঝে নেয়ার মনোবল তৈরি করতে হবে। এনজিও গোষ্ঠী তাদের তৎপরতা বৃদ্ধি করে নারীদের অধিকার সচেতন করে তুলতে পারে। আলেম সম্প্রদায় যথাযথ ভূমিকা নিয়ে ইসলামে নারীর মর্যাদাকে সাধারণ জনগোষ্ঠীর মাঝে তুলে ধরলে এর মাধ্যমে সুফল অর্জন সম্ভব। ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াকে ব্যবহার করে দেশের প্রথিতযশা ব্যক্তিরা এ ব্যাপারে গণসচেতনতা তৈরি করতে পারেন। যেমন সাম্প্রতিককালে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অংশগ্রহণে মিডিয়ায় যে প্রচারণা আসছে 'নারীকে তার প্রাপ্য দিলে, দেশ ও দশের সুফল মেলে' এ ধরনের প্রচারণা এ ক্ষেত্রে অনেকখানি সহায়ক হতে পারে। একই সঙ্গে নির্যাতন সংক্রান্ত অপরাধ, শাস্তির দৃষ্টান্ত এগুলো বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তুলে ধরে এ ব্যাপারে মানুষকে সচেতন ও দায়িত্বশীল হতে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। শিক্ষিত সমাজকে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে দায়বদ্ধ হতে হবে এবং সমাজের যেখানেই নির্যাতন হোক না কেন, সে ব্যাপারে সোচ্চার হয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। এর মাধ্যমে নির্যাতনকারী জনগোষ্ঠী সতর্ক ও সংযত হবে এবং ধীরে ধীরে নির্যাতন কমে আসবে।

বিশ্ব সভ্যতার উন্নতির পেছনে নারী ও পুরুষের অবদান সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। এ নারী সমাজকে উন্নয়নের কাতারে অংশীদার করার জন্যে একদিকে যেমন শিক্ষা ও সচেতনতা দরকার, অন্যদিকে যথোপযুক্ত পরিবেশ তথা সামাজিক নিরাপত্তা প্রয়োজন। তাই সভ্য জাতি হিসেবে বিশ্বে যদি আমাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করতে চাই, উন্নয়নে যদি নারীর অংশগ্রহণ করাতে চাই, তবে নারী নির্যাতন নামক কলঙ্কজনক অনুষঙ্গ থেকে আমাদের সরে দাঁড়াতে হবে। উপযুক্ত শিক্ষা এবং ব্যক্তি পর্যায় থেকে শুরু করে সমাজ, জাতি—সবার সহযোগিতা ও সচেতনতাই পারে আমাদের এ কলঙ্ক থেকে রক্ষা করতে।

লেখক : ডীন, স্কুল অব এডুকেশন অ্যান্ড ফিজিক্যাল এডুকেশন, উত্তরা ইউনিভার্সিটি